‘আমাদের সংস্কৃতির উপর সাম্প্রতিক হামলা’

সংস্কৃতি ও শিক্ষা : বিরাজমান পরিস্থিতি

আবুল কাসেম ফজলুল হক

গতকালকের পর

এখন ছাত্ররা শতকরা যে উচ্চহারে নম্বর পাচ্ছে, প্রথম শ্রেণী, প্রথম বিভাগ, স্টার, ইত্যাদি-গত দেড়শ’ বছরের মধ্যে কখনও তেমন দেখা যায়নি। পরীক্ষার ফল ভালো হলে তবে আমরা সকলেই আনন্দিত হই। প্রশ্ন হলো- আণবিক শক্তি কেন্দ্র, বিজ্ঞান গবেষণাগার, বিআইডিএস, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাঙলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ভালো ছাত্ররা পরবর্তী জীবনে চাকরিতে উন্নতি ছাড়া আর কি কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন? আবিষ্কার উদ্ভাবনের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু তার অনুকূল চর্চা কি এসব প্রতিষ্ঠানে আছে? আমরা জানি না। তবে প্রশ্ন হলো, জ্ঞানচর্চার সার্থকতা ছাড়া, সৃষ্টিশীলতা ও উৎপাদনে সাফল্য ছাড়া কোনো জাতি কি বেশিদিন সভ্য জগতে টিকে থাকতে পারে? সন্ত্রাস এবং সেশনজট নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। আলোচনা হওয়া ভালো। কিন্তু সব আলোচনা কি সৎ উদ্দেশে হয়? সন্ত্রাস ও সেশনজট হচ্ছে সমস্যার নিতান্তই উপরিতলের ব্যাপার। প্রাণশক্তির দিক দিয়ে বাঙলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এখন মুমূর্ষু, মৃতপ্রায়।

বাস্তবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত করা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবলম্বন--সিলেবাস, কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক ধ্বংস করার মাধ্যমে। এ কাজে আমাদের ডানপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী সব ধারার বুদ্ধিজীবীরা সমভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, আর রাজনীতিবিদেরা উদাসীন থেকেছেন। বিভিন্ন সময়ে সরকার ও আমলারা সর্বনাশের খাল কেটে দিয়েছেন। এ জন্য কেবল তাঁদের সঙ্গে যোগসাজশে ছিলেন রঙবে-রঙের বুদ্ধিজীবীরা। এর জন্য শুধু '৭১-এর কলাবরেটররা দায়ী তা নয়। কথাটা রূঢ় হলেও বলতে আমি বাধ্য যে, কলাবরেটরদের সঙ্গে মিলে মুজিব নগরী মুক্তিযোদ্ধারাও পাঠ্যপুস্তককে অধঃপাতে নিয়েছেন। আইয়ুব খানের আমলে বৈদেশিক সাহায্যের সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি ক্লাসে প্রতি বিষয়ের জন্য একটি মাত্র বই করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা হয়। যেমন ক্লাস থ্রি'র অংক বই সারাদেশে সকল স্কুলের জন্য একটাই থাকবে এবং টেক্সট বুক বোর্ড পন্ডিত ভাড়া করে তা লেখাবেন; ক্লাস এইটের বিজ্ঞান বই একটাই থাকবে এবং বোর্ড পন্ডিত ভাড়া করে তা লেখাবেন। ব্রিটিশ আমলের নিয়ম অনুযায়ী এক একটি ক্লাসের এক একটি বিষয়ের জন্য অনেক লেখকের অনেক বইকে অনুমোদন দেয়া হবে। তাতে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছিলো। প্রতিযোগিতায় ফল ভালো হতো। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে নিয়ম-কানুনে নানা পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, কিন্তু সব পরিবর্তনই শিক্ষার জন্য এবং জাতির জন্য ক্ষতিকর। অচিরেই পাঠ্যপুস্তক নিকৃষ্টতার চরম অবস্থায় পৌঁছে যায়। দালান-কোঠার ব্রিজ-কালভার্ট তৈরির টেন্ডার পদ্ধতির মতো পদ্ধতি অবলম্বন করে এ খানোর ব্যবস্থা করা হলো। পাঠ্যপুস্তক রচনায় লেখকের কোনো প্রকার স্বাধীনতাই অবশিষ্ট রাখা হয়নি।। পাঠ্যপুস্তকের লেখকদেরকে টাকার দাসে পরিণত করা হয়, পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রেও যে লেখকের স্বাধীনতার দরকার আছে, এ ব্যাপারটি ভুলিয়ে দেয়া হয় গত বিশ বছর যাঁরা সিলেবাস, কারিকুলাম ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা কেউ কখনও জনসধারণকে প্রচলিত ব্যবস্থায় সমস্যাবলী ও উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপায় সম্পর্কে কিছু অবহিত করেননি। আমাদের সংগ্রামী- অসংগ্রামী প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল সকল মহলের সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা টাকার দাসে পরিণত হয়ে পাঠ্যপুস্তককে ধ্বংস করে দিতে দ্বিধা করেননি। এ বছর প্রায় ছয় লাখ ছাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। এই হিসেবে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা কত দাঁড়ায়? এই বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করার কাজে বিরাট অংকের টাকা নাড়াচাড়া হয় তার পেছনে আছে সাহায্যদাতা আন্তর্জাতিক সংস্থার চক্রান্ত। পুস্তক ব্যবসায়ীদেরও ভূমিকা আছে। কেবল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকেরও একই দশা। বাঙলাকে ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাঙলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও জাতীয় শিক্ষার কিংবা স্বদেশী শিক্ষার আদর্শ অবশিষ্ট নেই। সিলেবাস, কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক নষ্ট করে ফেলার ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণশক্তিই নিঃশেষ হয়ে গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ছাত্র, শিক্ষক কারও মনেই শিক্ষাকে কেন্দ্র করে কোনো আনন্দ নেই। আনন্দের যোগ ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাণ পাবে কি করে?

বহুদিন ধরে চলে আসা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে বিকল্প কিছু ব্যবস্থা অবশ্য দাঁড় করানো হচ্ছে। আগে মিশনারীদের স্কুল-কলেজ ছিলো; এখন সেগুলোকে জোরদার করা হচ্ছে, মিশনারীদের স্কুলের সংখ্যা এখন অনেক বাড়ানো হয়েছে। এনজিও'র মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি স্কুল-কলেজকে এবং আগের বেসরকারি স্কুল-কলেজকে অচল অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে ক্যাডেট স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, আবাসিক মডেল স্কুল ও কলেজ এগুলো খুব জোরদার হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিরাজিত পুরানো সব অসঙ্গতি, বৈষম্য ও অবিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশবিদ্যালয়, স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ, প্রাইভেট টিচার্স টেনিং কলেজ স্থাপিত হয়েছে। জেনারেল জিয়ার শাসনকাল থেকে মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়িয়ে স্কুলের সংখ্যার সমান করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। মাদ্রাসার শিক্ষা অবশ্য আগের চেয়ে অনেক আধুনিক করা হয়েছে তবু জাতীয় সংস্কৃতিতে মাদ্রাসা শিক্ষিত ও স্কুল-শিক্ষিতদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ধনিক শ্রেণীর দিক থেকে জনসাধারণের উপর divide and rule কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে। জাতির জন্য এ ধরনের বৈষম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর হচ্ছে। শিক্ষা এখন নিরেট সার্টিফিকেট অর্জনের উপায়ে পর্যবষিত হয়েছে এবং এতে শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে নগদ টাকার পণ্যে। বাঙলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। এই পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে জাতীয় শিক্ষার, স্বদেশী শিক্ষা ও স্বাভাবিক শিক্ষার আদর্শ বাতিল হয়ে গেছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সন পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন নামে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিলো পরে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সেই স্বদেশী আদর্শ ব্যাপকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতা লাভ করে। স্বাধীন ভারতে জওহরলাল নেহেরুর সরকার সেই আদর্শকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। ভারত-সরকার এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আইএমএফ-এর এ গ্রুপে পড়েছে, এখন কি করবে বলা মশকিল তবে গত পঁয়তাল্লিশ বছরে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মতো প্রাণহীন ব্যবস্থায় পরিণত হয়নি। নানা

দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যদি প্রাণবান, সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সক্রিয় থাকত তাহলে যেসব নতুন আয়োজন চালানো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে ভেবে দেখা যেতো। প্রচলিত ব্যবস্থাকে রসাতলে নিক্ষেপ করে, স্বদেশী আদর্শ ও জাতীয় বিবেচনা বাদ দিয়ে নয়া উপনিবেশবাদী প্র চারনায় ও মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণীর অভিপ্রায় অনুসারে যে ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে তা দ্বারা দেশের শতকরা নব্বই ভাগ সাধারণ মানুষের কি কল্যাণ হবে? তবে ঘটনাপ্রবাহ এখন এক অপ্র তিরোধ্য গতি লাভ করেছে,কার সাধ্য এখন এই গতি পরিবর্তন করে?

P.T.O.

ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়েও গত পঁয়তাল্লিশ বছরে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলের চেয়ে উন্নত হয়েছে। আমরা কি করেছি এই পঁয়তাল্লিশ বছরে? সব দোষ কেবল এরশাদের উপর চাপালে কিংবা পাকিস্তানের উপর চাপালে তা দ্বারা কি আত্মপ্রতারণা ও পরপ্রতারণা দুই-ই করা হয় না?

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা গত বিয়াল্লিশ বছর ধরে শুনে আসছি। তার সঙ্গে জেনারেল জিয়ার শাসনকালে এসে যুক্ত হয়েছে 'গণশিক্ষা কর্মসূচি'। কিন্তু ফল কি হচ্ছে। মানুষকে যদি কাজ দিয়ে জীবিকা সংস্থানের কিছুটা উপায় করে দেয়া যায় তাহলে এসব প্রচারসর্বস্ব কার্যক্রমের কোনো দরকারই হবে না; মানুষ নিজের প্রয়োজনে অন্তরের তাগিদেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে তৎপর হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে নয়া উপনিবেশবাদী নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে গণশিক্ষা প্রচার পরিহার করে কর্মসংস্থানের উপায় বের করার চেষ্টা করলে তা মঙ্গলকর হবে। শিক্ষা সংস্থাপনের চেয়ে কর্ম সংস্থাপন ও খাদ্য সংস্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। নয়া উপনিবেশবাদী, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা প্রচার দ্বারা আমাদের ক্ষতি ছাড়া কল্যাণ হচ্ছে না। দরকার স্বদেশী শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা। তাতে বাইরের জগত থেকে গ্রহণ করে আত্মবিকাশের সুযোগ থাকবে। নয়া উপনিবেশবাদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কি কল্যাণ হবে জানি না। তবে টেলিভিশনের বিনোদনেরও মিথ্যা প্রচারের কাজে ব্যবহার না করে শিক্ষার কাজেই ব্যবহার করা উচিত ছিলো। তার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার হতো না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজন কি দেশের ভিতর থেকে জেগে ওঠা তাগিদের ফল? নাকি আরোপিত? প্ররোচণার ফল?

দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যদি প্রাণবান, সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সক্রিয় থাকত তাহলে যেসব নতুন আয়োজন চালানো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে ভেবে দেখা যেতো। প্রচলিত ব্যবস্থাকে রসাতলে নিক্ষেপ করে, স্বদেশী আদর্শ ও জাতীয় বিবেচনা বাদ দিয়ে নয়া উপনিবেশবাদী প্ররোচনায় ও মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণীর অভিপ্রায় অনুসারে যে ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে তা দ্বারা দেশের শতকরা নব্বই ভাগ সাধারণ মানুষের কি কল্যাণ হবে? তবে ঘটনাপ্রবাহ এখন এক অপ্রতিরোধ্য গতি লাভ করেছে কার সাধ্য এখন এই গতি পরিবর্তন করে?

অনেক সমস্যার কথা আমি উল্লেখ করলাম এবং আরও উল্লেখ করতে পারি। অনেক সমস্যার কথাই সকলেরই জানা। এসব সমস্যার প্রতিকার সম্ভব। তার জন্য চিন্তা-ভাবনা ও কর্ম দরকার। অনুশীলনের কথা দিয়েই আমি আলোচনা আরম্ভ করেছি। অনুশীলন দরকার। বাস্তবায়ন দরকার। জাতীয় মুক্তির ও গণমুক্তির সর্বাঙ্গীন সার্বিক কর্মসূচী, কর্মনীতি ও কর্মপন্থা দরকার। সে সম্পর্কে চিন্তা ও আলোচনা দরকার। জনপ্রিয় হুজুগ, জনপ্রিয় উত্তেজনা, জনপ্রিয়, আক্রোশ, জনপ্রিয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, জনপ্রিয় অন্ধবিশ্বাস, জনপ্রিয় কুসংস্কার, জনপ্রিয় অভ্যাস, আচার, আচরণ পরিহার করে পজিটিভ লক্ষ্যে এগোতে হবে। তার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বৃহত্তর রাজনৈতিক কার্যক্রম দরকার। সে সম্পর্কে আমি অন্যত্র লিখেছি, [দ্রষ্টব্যঃ লোকায়ত, দশম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ১৯৯২]; সে আলোচনার জন্য ভিন্ন আয়োজন দরকার। মুক্তির সন্ধানে আমাদেরকে অনেক চিন্তা করতে হবে, কাজ করতে হবে।

আবুল কাসেম ফজলুল হকঃ প্রাবন্ধিক, বুদ্ধিজীবী। অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধান সম্পাদক লোকায়ত।